১ পাশ্চাত্যে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব
[Origin of Sociology in the West]

অধ্যায়সূচী

∫∫ ① সমাজতত্ত্বের সূচনা ② ইউরোপে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ③ সমাজতত্ত্বের উদ্ভবে সহায়ক উপাদানসমূহ ∫ ∫

১.১ সমাজতত্ত্বের সূচনা (Beginning of Sociology)

ভূমিকা ॥ সুদীর্ঘকালের অতীত সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। অথচ সমাজতত্ত্বের ইতিহাস অল্পকালের। সমাজের বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব নিতান্তই নবীন। আবার এমন কথাও অসঙ্গত হবে না যে, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমাজতত্ত্ব অন্যতম প্রাচীন। সমাজ সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু জ্ঞানচর্চার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসাবে সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালেই। অধুনা সমাজতত্ত্বের ধ্যান-ধারণা এবং আলোচনার এলাকা আলাদা।

সমাজতত্ত্ব অন্যতম প্রবীণ সামাজিক বিজ্ঞান— সমাজ নিয়ে চিন্তা অনেক আগের ॥ প্রধান সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমাজতত্ত্ব অন্যতম। সভ্যতার আদিম অবস্থা থেকেই বিবিধ বিষয় ও মনের অনুসন্ধিৎসা মানুষের চিন্তা-চেতনায় অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। সেই সময় থেকেই সমাজ নিয়ে শুরু হয়েছে মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও অনুসন্ধান। কয়েক শতাব্দী আগেও মানুষ সমাজ, সামাজিক সংগঠনের অভিপ্রেত উপায়-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত ছিল। এই ভাবনার সুবাদেই মানুষ মানুষের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ, মানবসভ্যতার উত্থান-পতন প্রভৃতি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক আবেগ-আবেদন নিয়ে এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা পরিচালিত হয়েছে এবং মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এঁদের বলা হয়েছে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আইনপ্রণেতা প্রভৃতি। এদিক থেকে বিচার করে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, সমাজতত্ত্বের চতুর্বিধ উৎস বর্তমান। এই চারটি উৎস হল: রাজনীতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈব মতবাদসমূহ, এবং সামাজিক ও রাজনীতিক সংস্কারের জন্য আন্দোলনসমূহ।

প্রাচীন কালের সমাজচিন্তা ॥ সুপ্রাচীনকালেও মানুষ তার বসবাসের সমাজ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও মতামত ব্যক্ত করেছে। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও আইনপ্রণেতাদের রচনায় সমাজতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের প্রকৃতি, আইন, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার পদ্ধতিগত উদ্যোগ প্রাচীনকালের বিভিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌দের রচনায় পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেন: ভারতীয় দার্শনিক মনু, কৌটিল্য প্রমুখ; গ্রীক দার্শনিক প্লেটো-অ্যারিস্টটল; রোমান দার্শনিক সিসেরো প্রমুখ। এঁদের সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট রচনাগুলি হল: মনুর 'স্মৃতিশাস্ত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', প্লেটোর 'রিপাবলিক', অ্যারিস্টটলের' পলিটিক্‌স', সিসেরোর 'On Justice' প্রভৃতি। প্রাচীন কালের সামাজিক চিন্তার উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশ্ববিশ্রুত। সুতরাং হাজার কয়েক বছর আগেও সামাজিক চিন্তা ছিল। তবে ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত কোঁত (Auguste Comte)-এর উদ্যোগ-আয়োজনের সুবাদে উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানচর্চার স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন কথা বলা অসঙ্গত যে, তার আগে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা ছিল না।

মধ্যযুগের সমাজচিন্তা ॥ মধ্যযুগের সমাজচিন্তায় এবং আধুনিককালের গোড়ার দিক অবধি চার্চ বা গির্জার নির্দেশ ও শিক্ষাসমূহের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই সময়কালের পরিধিতে মানবমনের উপর অধিবিদ্যক ধ্যান-ধারণায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম ছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগের সমাজচিন্তায় অধিবিদ্যক ও কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাভাবনার অধিক্য ছিল। মধ্যযুগের সমাজচিন্তা বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্করহিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কালে চিন্তাবিদ্‌দের বৌদ্ধিক আলোচনা গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। মানবসমাজ ও তার প্রকৃতি, সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তার সমস্যাসমূহ প্রভৃতি বিষয়াদি সম্পর্কিত আলোচনা ক্রমশ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। মানুষের সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থা অনুধাবন ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমকালীন চিন্তাবিদ্‌দের আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়। সমকালীন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা ও উপাদানে সমৃদ্ধ অনেক প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চিন্তাবিদ্‌দের এই সমস্ত গ্রন্থ জ্ঞানচর্চায় জগতে রাজনীতি বা অর্থনীতি-বিষয়ক হলেও, এই সমস্ত গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক উপাদানের অভাব নেই। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল: ইতালীর চিন্তাবিদ্ নিক্কোলো মেকিয়াভেলি (Machiavelli)-র *The Prince*, ইংরেজ দার্শনিক হবস্ (Thomas Hobbes)-এর *Leviathan*, ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau)-র *Social Contract*, অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)-এর *Wealth of Nations*, মন্তেস্কু (Montesquieu)-র *The Spirit of Laws* প্রভৃতি।

সুদীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও সমাজতত্ত্বের স্বতন্ত্র ও সুসংবদ্ধ অনুশীলন শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। সমাজ নিয়ে অধ্যয়ন-অনুশীলন এবং সমাজের বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সময়ে। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন: অগস্ত কোঁত (Auguste Comte), হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim), ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) প্রমুখ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১.২ ইউরোপে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব (Origin of Sociology in Europe)

সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবের পটভূমি ॥ গোড়ার দিককার সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা উদ্ভাবিত ধ্যান-ধারণার মূল নিহিত ছিল সমকালীন ইউরোপের সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের মধ্যে। কারণ একটি সময়-কালে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সে সময়ে সৃষ্ট এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত ধ্যান-ধারণার সুযোগ-সম্পর্ক সবসময়েই থাকে। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের বিষয়টি ইউরোপের ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ইউরোপের ইতিহাসের এই পর্বে সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়। ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লবের মধ্যে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটে। ইউরোপীয় সমাজে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার এই পর্বটিকে বলা হয় জ্ঞানালোকিত অধ্যায়। এই অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকদের চেতনা-চৈতন্য। জ্ঞানালোকিত অধ্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে ঐতিহ্যবাহী চিন্তাধারায় র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবকে দেখার ও ভাবার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়।

ইউরোপে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বিকাশের মধ্যে মানবজাতি তার অসীম সম্ভাবনা অনুধাবন করতে আরম্ভ করে কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে। সেগুলি হল ঃ সমাজ ও প্রকৃতি উভয়কেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুশীলন করা সম্ভব; মানুষ মূলত যুক্তিবাদী; যুক্তিসঙ্গত বিবিধ নীতির উপর সমাজ গড়ে উঠেছে প্রভৃতি। বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সুবাদে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লবের সময় তা অধিকতর পরিশীলিত ও অভিব্যক্ত হয়। তারফলে সৃষ্টি হয় সমাজতত্ত্বের।

ইউরোপীয় সমাজের কাঠামো ও পরিবর্তন ॥ আগেকার ইউরোপ ছিল ঐতিহ্যবাহী। সমকালীন ইউরোপীয় সমাজ ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মীয় নেতারাই নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতেন। সমাজে রাজতন্ত্র ছিল দৃঢ়মূল। জনগণের উপর শাসন করার রাজকীয় ক্ষমতার প্রকৃতি ছিল ঈশ্বরীয়। সমকালীন ইউরোপের আর্থনীতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল জমি। সামন্তপ্রভুরাই ছিল জমিজমার মালিক। চাষীরা সামন্তপ্রভুদের জমিতেই কাজ করত। সমকালীন সামাজিক শ্রেণীসমূহ ছিল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও পৃথকীকৃত। জনসাধারণের জীবনধারায় পরিবার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়।

ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব নব্য ইউরোপের উদ্ভব ও বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। পুরাতন ইউরোপের যাবতীয় কেন্দ্রীয় বিষয়কে নতুন ইউরোপ চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে। সাবেককালের পুরাতন শ্রেণীসমূহ ছিন্নমূল হয়ে যায়। বিভিন্ন নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সামাজিক শ্রেণীসমূহের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। পারিবারিক আনুগত্যের পরিবর্তে মতাদর্শগত অঙ্গীকার প্রাধান্য পায়। ধর্ম বিবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ধর্ম তার সাবেকি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হারায়। অবশেষে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।

সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবের সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল ॥ সমাজতত্ত্বকে নূতন শিল্প সমাজের বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব হয়। সমকালীন ইউরোপ ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লবের প্রভাবাধীনে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল। যাইহোক এ প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব মৌলিক বিষয়াদির আলোচনার আগে বাণিজ্যিক বিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাণিজ্যিক বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত

হয়। উল্লিখিত দুটি বিপ্লবের সময়কালকে সাধারণভাবে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ (Renaissance) বলা হয়। এই নবজাগরণের সময় শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির পুনরুত্থান ঘটে।

বাণিজ্যিক বিপ্লব ॥ বাণিজ্যিক বিপ্লব বলতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তারকে বোঝায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এর সূত্রপাত ঘটে। অত্যন্ত সংগঠিতভাবে এবং ব্যাপক মাত্রায় ব্যবসা-বাণিজ্যের এই বিস্তার পরিলক্ষিত। এই কারণে এই ঘটনাকে বিপ্লব বলা হয়। ১৪৫০ সাল থেকে আরম্ভ করে মোটামুটিভাবে ১৮০০ সাল অবধি ক্রমান্বয়ে সংঘটিত ঘটনাবলীকে বাণিজ্যিক বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই বিপ্লবের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক পরিবর্তন স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। মধ্যযুগের ইউরোপের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী এবং স্থবির ও অনড় প্রকৃতির অর্থনীতি অধিকতর গতিশীল ও বিশ্বব্যাপী এক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। কিছু ইউরোপীয় দেশ তাদের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতাকে বিকশিত ও সুসংহত করার ব্যাপারে সক্রিয় হয়। এই দেশগুলি হল ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, স্পেন ও পর্তুগাল। তারফলে বাণিজ্যিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে।

বাণিজ্যিক বিপ্লবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। সাগরপারের বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার ও বিজয়ের ঘটনা ঘটে। চীন ও ভারতের মত প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। উত্তর ইতালীর ভেনিস ও জেনোয়া বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়। ইতালীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক একাধিপত্যের কারণে প্রাচ্য থেকে আমদানি করা মশলাপাতি ও সিল্কের দাম ছিল অত্যন্ত বেশি। স্পেন ও পর্তুগাল প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের এমন একটি রুট আবিষ্কারের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় যা হবে ইতালীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

এইভাবে স্থল পথ থেকে জলপথের রুট আবিষ্কারের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। নৌযাত্রা এবং অন্বেষণ অভিযানে পর্তুগীজরাই পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা লম্বা সমুদ্রযাত্রার পর সমুদ্রতীরবর্তী ভারতের মাটিতে পা রাখেন। স্পেনের রাজা ও রানীর বদান্যতায় ইতালীয় ক্রিসটোফার কলম্বাস ভারতের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপাড়ী দেন। স্পেন ও পর্তুগালের উদ্যোগকে অনতিবিলম্বে অনুসরণ করে বিট্রেন, ফ্রান্স ও হল্যান্ড। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যান্ড ও পর্তুগালের আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ল আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মালাক্কা, মসলা দ্বীপপুঞ্জ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারতের কতকাংশ। ব্যবসা-বাণিজ্য একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগে পরিণত হল এবং ইতালীয় শহরগুলির একাধিপত্যের অবসান ঘটল। বাণিজ্যিক বিপ্লবের বিকাশের ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগাল ও স্পেনের অবস্থানগত অবক্ষয় ঘটল। ইউরোপ ও বিশ্বব্যাপী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের কর্তৃত্ব কায়েম হল।

বিভিন্ন কোম্পানীর সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ॥ ক্রমশ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার ঘটল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ধরনের ব্যবসায়িক সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। ষোড়শ শতাব্দীতে নিয়ন্ত্রিত কোম্পানী-সমূহের সৃষ্টি হল। এই কোম্পানীগুলি হল বিভিন্ন বণিক বা সওদাগরদের সংগঠন। অভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সওদাগররা সমবায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যৌথ কারবারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক বিনিয়োগকারীর হাতে মূলধনের শেয়ার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত কোম্পানীর মধ্যে কতকগুলি ছিল সংশ্লিষ্ট সরকার অনুমোদিত চাটার্ড কোম্পানী। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সনদ বা চুক্তি মোতাবেক চাটার্ড কোম্পানীগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ॥ বাণিজ্যিক বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার। তার ফলে ঋণ প্রদানের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয়। সমগ্র ইউরোপে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বণিকরা অধিকতর সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'চেক' ব্যবস্থার সৃষ্টি ও প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সোনা ও রুপোর মুদ্রার জায়গায় কাগজী টাকা বা নোট প্রচলিত হয়।

নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি ॥ মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকার অর্জন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রায় প্রত্যেক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় বণিক, ব্যাঙ্কমালিক, বিনিয়োগকারী প্রভৃতি। এই অধ্যায়ে তাদের ক্ষমতা ছিল প্রধানত আর্থনীতিক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারা রাজনীতিকভাবেও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

পৃথিবীর ইউরোপীয়করণ ॥ 'ইউরোপীয়করণ' বলতে বোঝায় অন্যান্য সমাজব্যবস্থায় ইউরোপীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সঞ্চারিতকরণ। বিজেতা বণিক ও মিশনারীদের ক্রিয়াকর্মের সুবাদে আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয়করণের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর ঔপনিবেশিকতাবাদের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। তারফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়করণের প্রক্রিয়া প্রসারিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসের এই অধ্যায়ে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, চার্চের প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটে।

ঔপনিবেশিকতাবাদের বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়করণের প্রক্রিয়াও বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়। ইউরোপ বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক সম্প্রসারণে জোর কদমে অগ্রবর্তী হয়।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

নবজাগরণের অধ্যায়ে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। মানুষের বস্তুগত জীবনধারার উপরত' ঘটেই, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত মানুষের ধ্যান-ধারণার উপরও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস হল সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের কাহিনী। সামাজিক প্রেক্ষিতে বা পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের বাইরে বিজ্ঞানের অনুশীলন অসম্ভব।

বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা ॥ সমাজের বস্তুগত বা বৈষয়িক বিষয়াদির উপর বিজ্ঞানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। তেমনি সমাজের ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও বিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ-নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে না। মানুষের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বা তাগিদে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী এবং রোগ প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে আপনা-আপনি অকারণে নয়; মানুষের প্রয়োজন পূরণের তাগিদে।

সমাজে বিদ্যমান সাধারণ বৌদ্ধিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল বিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করে। অনুরূপভাবে আবার, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার অন্যান্য ক্ষেত্রে মনোভাব-মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করে। ইউরোপে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবের পিছনে বিজ্ঞানের সুবাদে বিভিন্ন আবিষ্কার ও ধ্যান-ধারণার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

মধ্যযুগে বিজ্ঞান ॥ নবজাগরণের যুগে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। এই সময় বিজ্ঞান আগেকার কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই সময় বর্ণনা ও সমালোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। নবজাগরণের যুগে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি বিজ্ঞান এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক বিষয়াদি নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। রসায়নবিদ্যার বিশেষ উন্নতি ঘটে। রসায়নের একটি সাধারণ তত্ত্ব বিকশিত হয়। বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন আরম্ভ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা স্বীকৃতি লাভ করে। মানবদেহের গঠন নিয়ে ডাক্তার এবং শারীরবৃত্ত-বিশারদরা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা শুরু করেন। শারীর সংস্থানবিদ্যা, শারীরবৃত্তবিদ্যা, রোগবিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতি ও মানবদেহের প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। প্রকৃতি এবং মানবদেহের চিত্রকলার অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। নৌচালন বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় অসামান্য অগ্রগতি ঘটে। সফল সমুদ্রযাত্রার জন্য জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান ছিল অপরিহার্য। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা জলপথে ভারতের বেলাভূমিতে পা রাখেন। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এই সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিকাশ ও বিস্তার ঘটে এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের সূত্রপাত ঘটে।

সমগ্র পুরাতন চিন্তাধারাকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে একেবারে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটে নিকোলাস কোপারনিকাস এর সময় থেকে। আগেকার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী স্থির আছে এবং সূর্য ও অন্যান্য স্বর্গীয় বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। একে বলা হয় ভূকেন্দ্রিক (geocentric) মতবাদ। কোপারনিকাশ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার অবতারণা করেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, সূর্য স্থির আছে এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। এই ধারণাকে বলা হয় সৌরকেন্দ্রিক (heliocentric) মতবাদ। এই সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ বৈপ্লবিক প্রকৃতির। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত সাবেকি চিন্তাধারাকে এই মতবাদ এক ঝটকায় উল্টে দেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বৃহৎ ব্যাপার। মানুষ-এর কেন্দ্রে নেই। মানুষ হল এই বৃহৎ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র।

নবজাগরণের পরবর্তী পর্বের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ

গ্যালিলিও, কেপলার এবং পরবর্তী কালে নিউটন প্রমুখ পদার্থবিদ্ ও গণিতবিদ্ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। বিজ্ঞানের অনুশীলনে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। প্রচলিত পুরাতন ধারণাসমূহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিবিধ বিকল্প ধারণা প্রস্তাবিত হয়। প্রস্তাবিত ধারণাগুলি যদি প্রমাণিত হয় এবং পুনঃপুনঃ পরীক্ষিত হয় তা হলে সেগুলি গৃহীত হয়। অন্যথায় নতুন সমাধানের অন্বেষণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা আবিষ্কার করেন। তার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে আবার নতুন করে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ হয়। পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরস্পর সংযুক্ত এক

ব্যবস্থা হিসাবে মানবদেহকে দেখা হয়। এই বিষয়টি কোঁত, হার্বার্ট স্পেনসার, এমিল দুর্খহেইম প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের সমাজচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।

চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)-এর *Origin of Species* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এই ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কালজয়ী মতবাদ তুলে ধরেন। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর সীমাবদ্ধ সম্পদ-সামগ্রীর জন্য সকল জীবই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সামিল হয়। এ রকম অবস্থায় 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' (Survival of the fittest)-ই হল স্বাভাবিক আইন। কিছু কিছু প্রাণী জৈবিক বিবর্তনের ধারা বিশেষ কিছু গুণগত যোগ্যতা বিকশিত করে এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় টিকে যায়; বাকি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চার্লস ডারউন-এর *Descent of Man* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। এই গ্রন্থে তিনি মানুষের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডারউইনের এই বইটি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। মানুষের উদ্ভবের পিছনে এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত ধারণা ছিল যে, ঈশ্বরই তাঁর পরিকল্পনা মত মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ডারউইন বল্‌লেন যে বানরের মত পূর্ব পুরুষ থেকে সুদীর্ঘকালীন বিবর্তনের ধারায় বর্তমান মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কিত এই মতবাদকে রক্ষণশীলরা স্বীকার করার সম্পূর্ণ বিরোধী। এতদ্‌সত্ত্বেও ডারউইনের বিবর্তনবাদ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিবর্তনবাদীরা বিষয়টিকে সমাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। এ বিষয়ে হার্বার্ট স্পেনসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবদেহের মত সমাজেরও নিরন্তর বিবর্তন ঘটছে। এই বিবর্তন বা বিকাশের গতি নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থার দিকে।

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ সালের ঘটনা। এই ঘটনাটি সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নতুন মোড় হিসাবে পরিগণিত হয়। ফরাসী বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটায় এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থার সূচনা করে। এই বিপ্লব ফরাসী সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের সূচনা করে। ফরাসী বিপ্লবের এই প্রভাব ইউরোপের সীমানা ছড়িয়ে যায়। অন্যান্য মহাদেশেও তা ছড়িয়ে পড়ে। তার ঢেউ ভারতেও এসে লাগে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা আছে। এ বিষয়ে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সাবেকি ফরাসী সমাজ কাঠামোগত বিচারে তিনটি এস্‌টেট (Three Estate)-এ বিভক্ত ছিল। সমকালীন ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'এসটেট' ছিল স্তরবিন্যাসের একটি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি এস্‌টেট-এর সঙ্গে সংযুক্ত মর্যাদা, বিশেষাধিকার ও নিয়ম-নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের একটি অংশ বা এসটেটকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করা হত। সামন্ততান্ত্রিক ফরাসী সমাজের তিনটি এস্‌টেট সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম এস্‌টেট (The First Estate) ॥ প্রথম এস্‌টটের অন্তর্ভুক্ত হলেন ক্লার্জি শ্রেণী (The Clergy)। ক্লার্জিদের মধ্যে স্তরবিভাজন ছিল। কিছু ক্লার্জি ছিলেন উচ্চস্তরের, যেমন কারডিনাল, (cardinal), আর্চবিশপ (archbishops), বিশপ (bishops), এবং অ্যাবট (abbot) । তাঁরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন এবং ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ মনযোগ দিতেন না।

দ্বিতীয় এস্‌টেট (The Second Estate) ॥ দ্বিতীয় এস্‌টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অভিজাত শ্রেণী (the nobility)। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও বিভাজন ছিল দ্বিবিধ: (১) তরবারির অভিজাত (nobles of the sword) এবং (২) পদমর্যাদাসূচক গাউনের অভিজাত (nobles of the robe)। প্রথমোক্ত অভিজাতরা ছিলেন বড় বড় জমিদার। নীতিগত বিচারে তারা ছিলেন জনসাধারণের রক্ষক। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা একটি পরজীবী শ্রেণী হিসাবে জীবন যাপন করতেন। কৃষকদের পরিশ্রমের ফসলেই তাঁদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা হত।

তৃতীয় এস্‌টেট (The Third Estate) ॥ তৃতীয় এস্‌টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজের বাকি সকলে। তাদের মধ্যে ছিলেন কারিগর, কৃষক, বণিক ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ। প্রথম এবং দ্বিতীয় এস্‌টেটের যথাক্রমে ক্লার্জি ও অভিজাতদের সঙ্গে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক ব্যবধান ছিল। প্রথম দুটি এস্‌টেটের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য রাজা দরিদ্রের শোষণ করে যেতেন। নৃপতির বিরুদ্ধে গরীব কৃষকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। অপরদিকে ক্লার্জি এবং অভিজাতরা রাজার তোষামোদি ও চাটুকারি করে যেত।

সমকালীন ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার মাত্র দু'শতাংশ ছিল ক্লর্জি এবং অভিজাত শ্রেণীর মোট সংখ্যা। অথচ দেশের মোট জমিজমার পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছিল এই দুটি শ্রেণীর হাতে। কৃষকরা ছিল মোট জসংখ্যার

আশি শতাংশ। অথচ কৃষকদের মালিকানায় ছিল মোট জমির মাত্র ত্রিরিশ শতাংশ। প্রথম দুটি এস্‌টেট-এর মানুষজন সরকারকে প্রায় কোন করই দিত না। অথচ কৃষকদের উপর বিবিধ করের পর্বতপ্রমাণ বোঝা চাপান ছিল। কৃষকদের চার্চকে, সামন্তভূস্বামীকে এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের কর দিতে হত। স্বভাবতই সমকালীন কৃষকদের উপর দারিদ্রের বোঝা চেপে বসেছিল। এস্‌টেটের বোঝা কৃষক শ্রেণীর কাঁধে চেপে বসেছিল। এর পরেও ১৭২০ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে ফ্রান্সে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ।

সমকালীন ফ্রান্সের কৃষক শ্রেণীর তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ছিল অনেক ভাল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বলা হত বুর্জোয়াশ্রেণী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বণিক, উকিল, উদ্যোগপতি, ব্যাঙ্কমালিক প্রভৃতি। এই সমস্ত শ্রেণীর মানুষজনও তৃতীয় এস্‌টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৭২০ সাল থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে মূল্যস্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু এতে বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন ক্ষতি হয়নি, বরং লাভ হয়েছে। এই সময় ফরাসী ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তারফলে বাণিজ্যিক শ্রেণীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ছিল বিত্তবান ও সুরক্ষাযুক্ত। কিন্তু প্রথম এসটেট ও দ্বিতীয় এসটেটের মানুষজনের মর্যাদার তুলনায় সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মানুষজনের তেমন কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

ফরাসী রাজতন্ত্র ॥ প্রায় দু'শ বছর ধরে ফ্রান্সে ব্রোবোঁ (Bourbon) নৃপতিদের রাজত্ব কায়েম ছিল। অন্যান্য দেশের চরম রাজতন্ত্রের মত ফ্রান্সেও রাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ঐশ্বরিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। ফরাসী নৃপতিদের ঈশ্বরীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল। ফরাসী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার বলে কিছুই ছিল না। বিভিন্ন ভূমিকায় নৃপতি এবং অভিজাত শ্রেণীকে পরিষেবা প্রদান করাই ছিল আমজনতার বিধিলিপি। রাজার আদেশই ছিল আইন। নৃপতির নির্দেশে ব্যক্তিমানুষকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক করা যেত। এই হল সমকালীন ফরাসী সমাজের রাজনীতিক চরিত্র।

চতুর্দশ লুই-এর সময় থেকে ফরাসী নৃপতিরা ব্যয়বহুল বিভিন্ন যুদ্ধের সামিল হয়েছেন। ১৭১৫ সালে চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু হয়। তখন ফ্রান্সের দেউলিয়া অবস্থা। এই দৈন্য দশা থেকে দেশকে উদ্ধারের ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার পরিবর্তে পঞ্চদশ লুই ব্যাঙ্ক থেকে লাগামছাড়া ঋণ নিতে থাকেন। সমকালীন ফরাসী সমাজের আর্থনীতিক অবস্থা ছিল এরকমই দুর্দশাগ্রস্ত।

ফ্রান্সে বৌদ্ধিক বিকাশ ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত ফ্রান্সেও কার্য-কারণ ও যুক্তিবাদিতার যুগ আরম্ভ হয়। সমকালীন কিছু যুক্তিবাদী দার্শনিক ফ্রান্সের মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট দার্শনিকদের অভিমত অনুযায়ী সকল সত্য বিষয়কে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন লক্ (১৬৩২-১৭০৪), মন্‌টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫), ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), এবং রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। জন লক্ ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক এবং উপরি উল্লিখিত বাকি তিনজনই ফরাসী দার্শনিক।

লকের অভিমত অনুযায়ী মানুষমাত্রেরই বিশেষ কিছু অধিকার আছে। কোন কর্তৃপক্ষই মানুষের এই সমস্ত অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার। লকের মতানুসারে যে শাসক মানুষের এই সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয় বা সংরক্ষণে সমর্থ নয়, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার সমূহ সংরক্ষণে সমর্থ অন্য শাসককে ক্ষমতাসীন করা উচিত। মন্টেস্কু ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির কথা বলেছেন এবং ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছেন। তাঁর মতানুসারে আইন, শাসন ও বিচার—সরকারের এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত নয়। ভলটেয়ার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বাক্ স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তিনি ব্যক্তিবর্গের অধিকার এবং বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। রুশোর অভিমত অনুযায়ী নিজেদের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে পছন্দ বা বাছাই করার অধিকার দেশের মানুষের আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ কেবল তাদের নিজেদের পছন্দের সরকারের অধীনেই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।। ফ্রান্সে 'এসটেটস-জেনারেল' (Estates-General) নামে একটি সংসদীয় সংস্থা ছিল। এই সংসদ গঠিত হত ফ্রান্সের তিনটি এসটেটের প্রতিনিধিদের নিয়ে। তবে এই সংসদের শেষ সভা আহুত হয়েছে ১৬১৪ সালে। ১৭৭৮ সালে রাজা চতুর্দশ লুই মর্যাদার তারতম্য নির্বিশেষে প্রত্যেকের উপর একটি কর আরোপে বাধ্য হন। ফ্রান্সের বাসতিল দুর্গ ছিল প্রাচীন রাজকীয় নিপীড়নের নিদর্শন স্বরূপ। ফরাসী বিপ্লবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে।

ফ্রান্সের 'সংবিধান পরিষদ' (Constituent Assembly (১৭৮৯-১৭৯১)] মানুষের অধিকার ঘোষণা করে। এই সংবিধান পরিষদ গঠিত হয়েছিল তৃতীয় এসটেটের সদস্য এবং অপর দুই এসটেটের কিছু উদারমনা

মানুষকে নিয়ে। এই পরিষদ বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং স্বৈরাচারী শাস্তির থেকে স্বাধীনতা স্বীকার করে। এই পরিষদ ক্লার্জি ও অভিজাত শ্রেণীর যাবতীয় বিশেষাধিকারের বিলোপ সাধন করে। রাজতন্ত্রের পিছনে ঐশ্বরিক মতবাদের সমর্থনকে অস্বীকার করা হয়। তা ছাড়া বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তন কার্যকর করা হয়। সংবিধান পরিষদের মানবাধিকারের ঘোষণায় বলা হয় যে, আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান হয়ে জন্মেছে এবং সমান হয়েই থাকবে।

১৭৯১ সালে ফরাসী নৃপতি গোপনে দেশত্যাগে উদ্যোগী হন। কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তিনি ধরা পড়ে যান। তাঁকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে আনা হয়। অতঃপর কার্যত অন্তরীণ অবস্থায় তাঁকে বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। প্যারিসে নতুন বিধানসভা [Legislative Assembly (১৭৯১-১৭৯২)] গঠিত হয়। এই সভা 'জিরনডিন' (Girondin) এবং 'জ্যাকোবিন' (Jacobin) নামে দুটি অত্যন্ত র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলি রাজাকে বিশ্বাসঘাতক ও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে প্রতিপন্ন করে। তারা ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। রাজা ষোড়শ লুইকে রাষ্ট্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে অভিযুক্ত করা হয় এবং অভিযোগ প্রমাণ করা হয়। ১৭৯৩ সালে ২১ জানুয়ারী তারিখে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। ঐ বছরই কিছু পরে রানীরও শিরচ্ছেদ করা হয়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। অতঃপর তিন বছর ধরে ফ্রান্সে সন্ত্রাস ও আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম হয়। এই সময় বহু অভিজাত, যাজক ও কিছু কিছু বিপ্লবীর শিরচ্ছেদের ঘটনা ঘটে।

১৭৯৫ সালে 'ডাইরেকটোরেট' (Directorate) গঠিত হয়। পরিচালকবর্গের এই দপ্তর চার বছর স্থায়ী হয়। ১৭৯৯ সালে পার্শ্ববর্তী 'করসিকা' নামক এক দ্বীপের নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে এক সেনানায়ক ডাইরেকটরেট-কে বাতিল করে দেন। তিনি নতুন পরিচালক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ফ্রান্সকে দীর্ঘ প্রতিক্ষীত স্থায়ী সরকারি ব্যবস্থা প্রদান করেন। নেপোলিয়ন কর্তৃক ডাইরেকটরেটকে বাতিল করার মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপীয় সমাজের রাজনীতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে এবং সামন্ততন্ত্রকে অপসারিত করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। ফরাসী বিপ্লবের সুবাদে তাৎপর্যপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গোড়ার দিককার সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিল্প বিপ্লব

ইংল্যান্ডে ১৭৬০ সালের দিকে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লব মানুষের সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনধারায় অর্থবহ পরিবর্তন সূচীত করে। এই পরিবর্তন প্রথমে আসে ইংল্যান্ডে, তারপর ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য মহাদেশে। শিল্পবিপ্লবের সময় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। তারফলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন শুরু হয়। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং সাংগঠনিক প্রকৌশলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আবিষ্কারের ঘটনা ঘটে। তারফলে কল-কারখানার মাধ্যমে উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সমাজের উপর শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ॥ শিল্পবিপ্লবের সুবাদে সমাজের আর্থনীতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচীত হয়। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবিধ সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে অধিকতর জটিল রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও ফিনান্স কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে। আবার নতুন নতুন পুঁজিপতি শ্রেণী, পরিচালক শ্রেণী ও শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। শিল্প বিপ্লবের বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি গোড়ার দিককার সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

(ক) সম্পত্তির রূপান্তর ॥ শিল্পবিপ্লবের সময় জমির উপর সাবেকি গুরুত্ব অরোপের মূল্য হ্রাস পায়। তার জায়গায় অর্থ ও মূলধনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা গুরুত্ব হারায় এবং নতুন পুঁজিপতিরা ক্ষমতাশালী হয়। নতুন শিল্প ব্যবস্থায় বিনিয়োগ স্বীকৃতি লাভ করে। আগেকার অনেক ভূস্বামী পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় অন্যান্য বিষয়াদির সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার উপর এর অর্থবহ প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ সম্পত্তির বিষয়টি আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনীতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থায় যে কোন পরিবর্তনের কারণে সমাজের মৌলিক প্রকৃতিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই মার্কস, টক্‌ভিল, ওয়েবার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সম্পত্তি এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনায় অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন।

(খ) প্রযুক্তি এবং কারখানা ব্যবস্থা ॥ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি ও কারখানা ব্যবস্থা নিয়ে অন্তহীন আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিক্যাল উভয় শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দেরই অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়নি যে, মানুষের জীবনধারাকে এই দুটি ব্যবস্থা চিরকালের জন্য বদলে দেবে। প্রযুক্তি ও কারখানা ব্যবস্থার সুবাদে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ শহরাঞ্চলে পরিযায়ী হয়। শহরাঞ্চলের কলকারখানায় মহিলা এবং কিশোর-কিশোরীরাও শ্রমশক্তি সরবরাহের সামিল হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

পরিবর্তন দেখা দেয়। জীবন ও কর্ম নৈর্ব্যক্তিক হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে মেসিনের কাছে মানুষের দাসত্বের সৃষ্টি হয় এবং শ্রমের বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী শিল্পোৎপাদনের ব্যবস্থার পরিণামে নারী-পুরুষ হৃদয়ে এবং হাতে যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। মার্কস, দুর্খহেইম, ওয়েবার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়।

শ্রমের অবস্থা ॥ এই সময় একটি শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কলকারখানায় কাজ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। গোড়ার দিকে এই শ্রেণীটি দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় বসবাস করত। সামাজিক দিক থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত। কিন্তু নতুন শিল্প ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। স্বভাবতই অনতিবিলম্বে তারা একটি ক্ষমতাশালী সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর এই দারিদ্র্য হল সামাজিক দারিদ্র্য, স্বাভাবিক দারিদ্র্য নয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক শ্রেণী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়।

নগরায়ন ॥ শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে নগরায়ন অনস্বীকার্য। শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কেন্দ্রগুলির চারপাশে জনসংখ্যা ও জনবসতি বাড়তে থাকে। ছোট-বড় আধুনিক শহর গড়ে উঠতে থাকে। এথেন্স ও রোমের মত শহর প্রাচীনকালেও ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের বয়নশিল্পের কেন্দ্র ম্যানচেস্টার হল নতুন প্রকৃতির এক নগর। প্রাচীনকালে শহরগুলি ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির আধার এবং মাধুর্যময় ও সৌন্দর্যপূর্ণ গুণাবলীর আকর। বিপরীতক্রমে আধুনিক শিল্প-শহরগুলি হল দারিদ্র্য ও অমানবিকতার কেন্দ্রভূমি। শিল্প-শহরের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গোড়ার দিককার সমাজতাত্ত্বিকদের আগ্রহ আকর্ষণ করেছে।

সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের পিছনে বৌদ্ধিক প্রভাব ॥ ইউরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তনমুখী বিবিধ শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। এরই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সমাজতত্ত্বের। সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলে উদ্ভূত বিষয়াদি গোড়ার দিককার সমাজতত্ত্বে বারে বারে আলোচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত অবস্থার চিন্তাবিদ্‌রা প্রাথমিক অবস্থার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। বিভিন্ন কারণে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের উদ্ভবের আলোচনায় আলোকপ্রাপ্ত আমলটি একটি নতুন মোড় হিসাবে পরিগণিত হয়। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

(ক) বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা-অনুশীলনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করে সমকালীন চিন্তাবিদ্‌রা মানবীয় অবস্থাসমূহ সম্পর্কে সুসংহত আলোচনার সূত্রপাত করেন। মানব জাতি, তাদের প্রকৃতি এবং মানব সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁরা সচেতনভাবে বিজ্ঞানসম্মত বিবিধ নীতি প্রয়োগ করেন।

(খ) যুক্তিবাদ ॥ বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানবীয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বা প্রায়োগিকতা পর্যালোচনা ও পরিমাপের ক্ষেত্রে তাঁরা যুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষ মূলত যুক্তিবাদী। এই যুক্তিবাদিতার সুবাদে চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতা সম্ভব।

(গ) পূর্ণতা অর্জনে মানুষের সক্ষমতা ॥ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হওয়ার যোগ্যতাযুক্ত। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা ও পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে নিজেদের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা সৃষ্টি সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন। এই স্বাধীনতা তাঁদের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত ও বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

পরবর্তী কালে আরও তিনটি বৌদ্ধিক প্রভাব ইউরোপে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুলেছে। সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রভাব হল : (১) ইতিহাসের দর্শন, (২) বিবর্তনের জীববিদ্যামূলক মতবাদ এবং (৩) সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা। উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধিক প্রভাবকে সমাজতত্ত্বের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গোড়ার দিককার সমাজতাত্ত্বিকদের রচনায় এ সবের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

(১) ইতিহাসের দর্শন।। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতিহাসের দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক প্রভাবে পরিণত হয়। এই দর্শনের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, সমাজের অগ্রগতি ঘটেছে পরপর বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে। এই অগ্রগমন সরলতা থেকে জটিলতার দিকে। বিজ্ঞানসম্মত বিচারের দিক থেকে এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক আমল বা সময়কাল এবং সামাজিক ধরন বা প্রকারের ধারণার কথা বলা হয়েছে।

ইতিহাসের দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে জিয়ামবাত্তিস্তা (Giambattista) ও অ্যাবে সাঁ পিয়েরে (Abbe Saint Pierre)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই চিন্তাবিদ্ সমগ্র সমাজকে নিয়েই চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁদের সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা-অনুশীলন কেবল রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক

বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তী কালে কোঁত, স্পেনসার, মার্কস প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদের আলোচনায় ইতিহাসের দর্শনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

(২) বিবর্তনের জীববিদ্যামূলক মতবাদ ॥ বির্তনের জীববিদ্যামূলক মতবাদ ইতিহাসের দর্শনের প্রভাবকে অধিকতর অগ্রবর্তী করেছে। সমাজতত্ত্ব বিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের প্রধান পর্যায়গুলিকে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাই হল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। জীববিদ্যামূলক ধারণার ভিত্তিতে এ ধরনের আলোচনার কথা বলা হয়। সমাজকে জীবদেহের মত ভাবা হয় এবং সামাজিক বিবর্তনের ধারা আলোচনা করা হয়। এ ধরনের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে হার্বার্ট স্পেনসার এবং এমিল দুর্কহেইম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩) সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা।। আধুনিককালের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সামাজিক সমীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক সমাজতত্ত্বে সামাজিক সমীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধির পিছনে দুটি কারণ বর্তমান। (এক) বিশ্বাস করা হয় যে, মানবীয় বিষয়াদিকে শ্রেণীবিভক্ত এবং পরিমাপ করা সম্ভব এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ সমাজতত্ত্বে প্রয়োগ করা সম্ভব ও করা উচিত। (দুই) সামাজিক সমস্যা হিসাবে দারিদ্র্য সম্পর্কিত আলোচনা আধুনিক সমাজতত্ত্বে স্থান পায় এবং দারিদ্র্যকে প্রাকৃতিক না বলে সামাজিক বলা হয়। সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মুখ্য উপায় হল সামাজিক সমীক্ষা। বিশ্বাস করা হয় যে, সমাজে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানের ক্ষেত্রে সমকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা বা জ্ঞান অর্জন আবশ্যিক। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে সামাজিক সমীক্ষা অপরিহার্য।

১.৩ সমাজতত্ত্বের উদ্ভবে সহায়ক উপাদানসমূহ (Factors helping the Emergence of Sociology)

সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের পিছনে বিভিন্ন উপাদানের অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের শেষের দিকে পশ্চিমী চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময় সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটি ধারার সূত্রপাত ঘটে। এ রকম এক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন-অনুশীলন শুরু হয়। সামাজিক পরিবেশ জ্ঞানচর্চার যে কোন শাখার বিকাশ ও বিস্তারকে প্রভাবিত করে। সমাজতত্ত্বও সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয়, সমাজতত্ত্ব সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমন্ডলকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। সমাজতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু 'সামাজিক অবস্থা' বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এই সমস্ত সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

(এক) শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদের উদ্ভব (Industrial Revolution and Origin of Capitalism)

সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই ঘটনাটি সমগ্র ইউরোপব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ রকম ব্যাপকভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। নতুন নতুন শিল্প সংস্থা ও প্রযুক্তি সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের চেহরা চরিত্রই বদলে দেয়। কলকারখানার মাধ্যমে উৎপাদন, উৎপাদন ব্যবস্থার যন্ত্রায়ণ, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া প্রভৃতি সমাজব্যবস্থায় আলোড়ন ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে। আগে ছিল ক্ষুদ্রায়তনে কুটির শিল্প এবং সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনধারা। তার জায়গায় বৃহদায়তনে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন শুরু হল এবং জটিল প্রকৃতির শহুরে জীবনধারা শুরু হল। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধ, মতাদর্শ, রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি হয় একেবারে বাতিল হয়ে গেল বা আগাপাশতলা পরিবর্তিত হয়ে গেল। মানবসভ্যতার গতিমুখ বদলে গেল। পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের এ রকম মৌলিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব স্বাভাবিক হয়ে পড়ল।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ কতকগুলি পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) শিল্পপ্রধান দেশের সৃষ্টি ॥ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ছিল বহুবিধ। তার ফলে পশ্চিমের কৃষিপ্রধান দেশসমূহ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়। নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। আবিষ্কৃত সহজ উৎপাদন পদ্ধতির সুবাদে অল্প সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব হয়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-কারখানাগুলি ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। অনেকেই সাবেকী কৃষিকর্ম ছেড়ে শ্রমিক হিসাবে বিকাশমান শিল্পে যোগ দেয়।

(২) বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন ॥ শিল্পবিপ্লবের ফলে দ্রুত গতিতে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সৃষ্টি হয়।

গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা শহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। শিল্প শ্রমিক হিসাবে তারা বিপজ্জনক কাজকর্মে যোগ দেয়। দ্রুতগতিতে শহরের সংখ্যা ও এলাকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বড় বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। অভিজাত শ্রেণিসমূহ এবং রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারীদের অবক্ষয় ঘটতে থাকে। আবাসনের অভাবের কারণে বস্তির জীবনধারা শুরু হয়। শহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে অপরাধপ্রবণতা বাড়তে থাকে। ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। সাবেকি সামাজিক সম্পর্কসমূহ হীনবল হয়ে পড়ে। এ রকম পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির পর্যালোচনা ও সুরাহার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন-অনুশীলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন (Ian Robertson) তাঁর *Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন: "For the first time in history, rapid social change become the normal rather than an abnormal state of affairs, and people could no longer expect that their children would live much the same lives as they had done. The direction of social change was unclear, and the stability of the social order seemed threatened. An understanding of what was happening was urgently needed."

(৩) বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী ॥ শিল্প ও পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থায় শক্তিশালী এক আর্থনীতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তারের কারণে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে ওঠে বিত্তবান শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী। বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণার পূজারী হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করল। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে অনেকাংশে আলগা করে তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের সামিল হল। কালক্রমে পরম পরাক্রমশালী হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির লাগাম নিজেদের হাতে নিল। অতঃপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহায়ক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হতে শুরু করল।

(৪) মেহনতী মানুষের সংগঠন ॥ উৎপাদিত পণ্য সামগ্রির বৈচিত্র্যে ও বিপুল সম্ভারে বাজার ভরে গেল। ভোগপণ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ভোগবাদী সমাজের সৃষ্টি হয়। পণ্যসামগ্রীর বাজারের বিকাশ ও বিস্তার আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর বহুবিধ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে মুনাফা জমতে লাগল। বিশাল শ্রমজীবী জনতা কম পারিশ্রমিকে অধিক সময় ধরে শ্রম দিতে থাকল। এ ধরনের শিল্প ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকল। তার ফলে শ্রমজীবীদের বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকল। অর্থাৎ মেহনতী মানুষের দল সংগঠিত হয়ে শ্রেণিসংগ্রামের সামিল হল।

(৫) বিরোধের সৃষ্টি ॥ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কারণে বিকাশমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষীয়মান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংঘাত শুরু হল। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় এটি হল একটি প্রধান সংঘাত বা বিরোধ। তাছাড়া কিছু অপ্রধান বিরোধও দেখা দিল। এগুলি হল: (ক) রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ, (খ) অভিজাতদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিরোধ, (গ) গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরাঞ্চলের বিরোধ, এবং (ঘ) অধিবিদ্যার সঙ্গে যুক্তিবাদের বিরোধ। এই সমস্ত বিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবের অবদানও অনস্বীকার্য।

(৬) যুক্তিবাদের বিকাশ ॥ শিল্পবিপ্লবের সুবাদে প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। স্বাভাবিকভাবে মানুষের আত্মবিশ্বাস বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এ রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুক্তিবাদের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। সাবেকি অধিবিদ্যক ও ধর্মাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার অবক্ষয় শুরু হয়।

(৭) বুর্জোয়াদের উদ্যোগ ॥ বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের শক্তিকে সুসংহত ও স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় হয়। বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক আধিপত্যকে নিরাপদ করা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে বুর্জোয়ারা তাদের ধণতান্ত্রিক আর্থনীতিক উদ্যোগ-আয়োজন অপ্রতিহতভাবে পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় হয়। তারা সাবেকি অভিজাত শ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক পুরাতন প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধসমূহের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের সামিল হয়। নতুন ধরনের সমাজচিন্তা ও মূল্যবোধ ব্যতিরেকে বুর্জোয়াদের পক্ষে তাদের স্বার্থসাধন সম্ভবপর ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতি পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরনের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে।

(৮) অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ॥ শিল্পবিপ্লবের ফলে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। কারণ এই সময় পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং যোগাযোগ ও পরিবহণব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়।

(৯) উপনিবেশ স্থাপন ॥ শিল্পবিপ্লবের অন্যতম পরিণাম হিসাবে ঔপনিবেশিকতার সৃষ্টি হয়। কারণ

শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর জন্য দেশের বাইরে বাজারের এলাকাকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ রকম পরিস্থিতির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ নতুন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন মহাদেশে উপস্থিত হয়। অতঃপর তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের কাজে সফল হয়।

(১০) ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধ ॥ অতঃপর ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। নতুন নতুন উপনিবেশের দখলদারি নিয়ে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরিণামে যুদ্ধ বাধে। ভারতীয় উপমহাদেশের মত অন্যান্য অঞ্চলে ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েম করা নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলতে থাকে।

মন্তব্য ॥ শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদ এবং এই দু'-এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার পরিণামে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। তার ফলে সাবেকি ইউরোপীয় সমাজের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন পর্যালোচনার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সম্পর্কিত নতুন একটি বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। অগাস্ত কোঁত, হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সমাজের বিজ্ঞান হিসাবে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। সমাজের বিবিধ সমস্যা ও প্রকৃতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রটি সাহায্য করবে এবং সামাজিক সমস্যাদির সুরাহার পথনির্দেশ করবে। কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, এমিল ডুর্কহেইম, জর্জ সিমেল প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

(দুই) রাজনীতিক বিপ্লবের প্রভাব (Impact of Political Revolution)

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজনীতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। রাজনীতিক বিপ্লবসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার পরিণামে নতুন করে সামাজিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের পথ সুগম হয়। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিক বিপ্লব বলতে মূলত ফরাসী বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তি হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের অবদান অনস্বীকার্য।

ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ সালে সংঘটিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব নতুন যুগের সূত্রপাত করে। বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অস্থিরতাপূর্ণ। সমকালীন ফ্রান্সে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য ছিল ব্যাপক; ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল বিপর্যস্ত। এ সবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফরাসী বিপ্লব-সংঘটিত হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের পরবর্তী কালে নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। কিন্তু এই একনায়কতন্ত্র ও সন্ত্রাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতির কারণে ইউরোপে যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং মানুষের নিরাপত্তা বহুলাংশে বিঘ্নিত হয়। যাই হোক, ফরাসী বিপ্লবের সুবাদে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রবলভাবে প্রতিপন্ন হয়। সমকালীন সমগ্র ইউরোপে এই সমস্ত রাজনীতিক আদর্শ সত্ত্বর ছড়িয়ে পড়ে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই সমস্ত আদর্শ আলোড়নের সৃষ্টি করে। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। অতঃপর ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ শুরু হয়। চিন্তা-চেতনার জগতে সাম্য ও স্বাধীনতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রশক্তির পীড়নমূলক ভূমিকার পরিবর্তে সামাজিক সাম্য ও রাজনীতিক স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ রকম অবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সমস্ত পর্যালোচনার জন্য সমাজতত্ত্বের মত একটি সামাজিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

(তিন) নগরায়ণের প্রভাব (Impact of Urbanisation)

নগরায়ণ প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কারণে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়। শিল্পায়নের বিকাশ ও বিস্তারের সুবাদে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। শিল্পায়নের সুবাদে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। শিল্পকারখানায় কাজকর্মের সন্ধানে গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ শহরে এসে ভিড় করে। শহরাঞ্চলে বহিরাগতদের চাপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তার ফলে শহর ও শহরতলীগুলিতে বিবিধ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মাত্রাতিরিক্ত ঘন জনবসতি, বস্তিজীবন, পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্যহানি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সমস্যাদির মোকাবিলার উপায়-পদ্ধতি নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও পর্যালোচনা শুরু হয়। এ ধরনের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায়

সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহী হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবার ও সিমেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(চার) ধর্মের প্রভাব (Impact of Religion)

শিল্পবিপ্লব, ফরাসীবিপ্লব ও নগরায়ণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সামাজিক পরিবর্তনের উপর পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। মানুষের সামাজিক জীবন সম্পর্কিত আলোচনায় এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌রা ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতিফলনের পক্ষপাতী। ধর্মীয় রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে তাঁরা সমাজকল্যাণ সাধনের পরিকল্পনা করেন। সমকালীন সমাজচিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই বৃত্তিগত বিচারে বা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মাচরণমূলক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেরই ধর্মীয় পটভূমি ছিল।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের মতবাদের মধ্যে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই এমিল ডুর্কহেইমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। তাঁর রচনায় নৈতিকতার প্রভাবও অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবারের নামও উল্লেখযোগ্য। দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মের প্রসঙ্গে ওয়েবারের লেখায় বিস্তারিত আলোচনা আছে। ট্যালকট পারসন্স-এর রচনায়ও নীতিমালার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায়ও ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তবে এ আলোচনা অবশ্যই বিরূপ সমালোচনামূলক।

(পাঁচ) ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাব (Impact of European Enlightenment)

নবজাগরণের যুগে ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের অধ্যয়ন-অনুশীলনে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ইউরোপের সম্পদশালী দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান শুরু হয়। রেনেসাঁসের সময় থেকে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং আমলাতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তার শুরু হয়। বুদ্ধিবৃত্তি- চর্চার সহায়ক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্টপোষকতায় উচ্চমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে ওঠে। সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা এক সঙ্গে বিবিধ বিষয়ের অনুশীলন করতেন। স্বভাবতই সে সময়ে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট আকারে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়নি। এই সময় সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং সমকালীন আদর্শগত ভাবধারাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সামাাজিক জীবনের সাধারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও নতুন সূত্র নির্ধারণে সক্রিয় হন। সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহের সুবাদে আধুনিক সমাজতত্ত্বের অনুশীলন আরম্ভ হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, সেই সময়ে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটে এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনাধীনে রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক স্থিতিশীল বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এরকম এক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের মধ্যে সামাজিক জ্ঞানচর্চার সহায়ক পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। স্বভাবতই সমাজ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি সামাজিক বিজ্ঞান গড়ে তোলার ব্যাপারে সমকালীন সামাজিক চিন্তাবিদ্‌রা স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আবার সমকালীন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পৃথক প্রকৃতির কিছু তথ্য সর্বসমক্ষে আসে। প্রাচ্যের এবং আমেরিকা-আফ্রিকার উপজাতীয় জনসম্প্রদায় এবং অপ্রতীচ্য প্রকৃতির সমাজসমূহে সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে ভাবনা-চিন্তার এক নতুন দুনিয়া উন্মোচিত করে। চুক্তিবাদী সমাজবিজ্ঞানী হবস্, লক্ ও রুশোর প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) সম্পর্কিত ধারণার আধুনিক সভ্যতায় উত্তরণ অগস্ত কোঁতের বিবর্তনবাদী সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে পরিণত হয়েছে।

সমকালীন ইউরোপে সমাজতত্ত্বের ধ্যান-ধারণার বিকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানচর্চা হতে থাকে। কোঁত এবং ডুর্কহেইমের মত সমাজতত্ত্ববিদ্‌রাও বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা পরিচালনায় সক্রিয় হন। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মডেলের অনুসরণে সমাজতত্ত্ব অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। তেমনি আবার ম্যাক্স ওয়েবার সমাজ-জীবনের স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেন। তিনি সমাজতত্ত্বের জন্য পৃথক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাফল্যের নজির বেশ কয়েকজন সমাজচিন্তাবিদ্‌কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে সকল উপায়-পদ্ধতি সফল হয়েছে সামাজিক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপায়-পদ্ধতি সফল না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। স্বভাবতই অগাস্ত কোঁত, হারবার্ট স্পেনসার, এমিল ডুর্কহেইম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদ্ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপন্ন করেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ সমাজব্যবস্থার অনুশীলন-অনুধাবনে প্রয়োগ করা যায়।

(ছয়) সমাজতন্ত্রের উদ্ভব (Origin of Socialism)

শিল্পবিপ্লবোত্তর পর্বে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সুরাহার ব্যাপারে সমাজচিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ম্যাক্স ওয়েবার, এমিল ডুর্কহেইম প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদ্‌রা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সামাজিক সংস্কার সাধনের উপর জোর দেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্যাদির সম্যক সমাধানের উপায় হিসাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্ল মার্কসের নাম প্রথমেই প্রণিধানযোগ্য। মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। অপরদিকে ওয়েবার পুঁজিবাদী সমাজের উৎখাতের পরিবর্তে তার সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন। ওয়েবারের কাছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সম্ভাব্য সমস্যাদি অধিকতর বিপজ্জনক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীরা সেভাবেই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে গড়ে তুলেছেন। তাঁরা মার্কসবাদী দর্শন বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণাকে পরিশীলিত করার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছেন।

(সাত) ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রভাব (Impact of Colonial Powers of Europe)

ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের সমাজ-সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এশিয়া-আফ্রিকা বা প্রতীচ্যের উপনিবেশগুলির সমাজ-সংস্কৃতির সামনে বিপরীত প্রকৃতির ইউরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতি উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হয়। এ রকম অবস্থায় সমকালীন সমাজচিন্তাবিদ্‌রা এক গুরুতর বৌদ্ধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হন। পরস্পর বিপরীত প্রকৃতির সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা সম্পর্কিত তথ্যাদি সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরে। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের সমাজ উন্নত এবং কোন কোন অঞ্চলের সমাজ পশ্চাদপদ। দুনিয়ার সর্বত্র সামাজিক পরিবর্তনের হার সমান নয়। এই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে 'সমাজতত্ত্ব' শীর্ষক শাস্ত্রটির উদ্ভব হয়েছে।

(আট) প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত অবদান (Institutional and Personal Contribution)

বিবিধ উৎস ॥ সামাজতত্ত্বের উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত অবদানও অনস্বীকার্য। সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক বিষয়সমূহ সম্পর্কিত একটি সাধারণ বিজ্ঞান। সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের পিছনে বিবিধ উপাদান বর্তমান। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সামাজিক মনস্তত্ত্বের গবেষণা, প্রতিষ্ঠানমূলক ও ইতিহাসমূলক অর্থনীতির গবেষণা, ইতিহাসবিদ্যা ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির সাধারণীকরণের উদ্যোগ-আয়োজন, মানবপ্রজাতির বিবর্তন ও আদিম জীবনধারার বিবর্তন প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনা, প্রশাসনিক তথ্যাদি, সমাজসংস্কারকগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি প্রভৃতি।

রাজনীতিক উপাদান ॥ সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে রাজনীতিক উপাদানসমূহের অবদানও অস্বীকার করা যায় না। সংস্কারমূলক ও রাজনীতিক আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের সুবাদে সমাজ সম্পর্কিত স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্বের আলোচনা রাজনীতি অভিমুখী হয়ে পড়তে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সুবাদে শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিক আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটে। এই সময় বিভিন্ন রাজনীতিক দলও গঠিত হতে থাকে। এ সব বিষয়ে শিল্পবিপ্লব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির শাসনব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। এই সময় রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তার মধ্যে গভীর সংযোগ-সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত চিন্তাবিদের চিন্তাধারায় এই সংমিশ্রণ ঘটে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে : সাঁ সিমোঁ, অগাস্ত কোঁত, টকভিল, কার্ল মার্কস, জন স্টুয়ার্ট মিল, হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ। এই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের রাজনীতিক ও জনমুখী আগ্রহ ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার জগতের সঙ্গে অল্পবিস্তর সংযোগ-সম্পর্ক ছিল। সমাজতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে এই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের অবদান অনস্বীকার্য।

ফরাসী চিন্তাবিদ অগাস্ত কোঁত ছিলেন 'দৃষ্টবাদী' (positivist)। সামাজিক বিষয়াদিকে তিনি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অনুধাবন-অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজসংস্কারক। মানবতার নতুন ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কোঁত সাঁ সিমোঁর রাজনীতিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্র একটি সামাজিক বিজ্ঞান গড়ে তোলেন। এই সামাজিক বিজ্ঞানটিকে তিনি 'সমাজতত্ত্ব' নামে চিহ্নিত করেন। সমাজতত্ত্বের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে হার্বার্ট স্পেনসার সমাজতত্ত্বের আলোচনায় ডারউনীয় মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং এই শাস্ত্রটির তত্ত্বনির্মাণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছেন। তিনি বিবর্তনবাদের

মাধ্যমে 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন'—এই নীতিটিকে তুলে ধরেছেন। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং এই সামাজিক বিজ্ঞানটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে বিবৃত করার ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সমাজতত্ত্বের বিকাশের গোড়ার দিকে কার্ল মার্কসের সদর্থক ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক ও জনমুখী আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাজগতের সঙ্গে অল্পবিস্তর সংযোগ-সম্পর্ক মার্কসের মধ্যে ছিল। সমাজতত্ত্বের 'সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব' মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ও আর্থনীতিক নিশ্চয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন-অনুশীলনে সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের গুরুত্ব আজও অস্বীকার করা যায় না।

সমাজতত্ত্বে তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানমূলক অনুশীলন শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময় তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়ে তোলার উদ্যোগ-আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে জার্মান শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকদের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজতত্ত্ব পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

জার্মান সমজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবার উদারনীতিক সংস্কারবাদী সংস্থার সামিল হয়েছিলেন। বিস্তৃত সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতে তিনি ঐতিহাসিক উপাদানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ আর্থনীতিক ও আইনমূলক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালিত করেন।

এমিল ডুর্কহেইম সমাজতত্ত্বকে একটি যথার্থ বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ও আন্তরিক ছিলেন। এই কারণে তিনি সকল তত্ত্বকে প্রমাণার্থ সত্য বলে ধরে নিয়ে সেগুলিকে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকল তত্ত্বকে সুসংবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তুলনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। দর্শনে ডুর্কহেইমের আগেকার শিক্ষা ছিল। এই শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি উদ্ভাবন করেছেন এক নতুন আঙ্গিক। এই আঙ্গিকের দ্বারা বিদ্যমান সামাজিক তথ্যাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব। রিপাবলিকপন্থী তথা মধ্যপন্থী সমাজ-সংস্কারক ডুর্কহেইম জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্থায়িত্বের পক্ষে ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীবাদী শক্তির উদয় ও বিকাশ ঘটে। নাৎসীবাদীরা সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিরোধী ছিল। স্বভাবতই সমাজতত্ত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯৪৫ সালের মে মাসে। তার পরেও অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ব্রিটেনে সমাজতত্ত্বের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের সময় থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ব্রিটেনে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই সময় থেকে সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন অনুশীলনের ব্যাপ্তি ঘটে। এবং এই সামাজিক বিজ্ঞানটির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।